هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

তাফহীমুল কুরআন

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

আল মু'মিনূন

২৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়। প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি। ৭৫–৭৬ আয়াত থেকে পরিষ্কার সাক্ষ পাওয়া যায় যে, মক্কী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়। উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাযিল হওয়ার আগেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারীর বরাত দিয়ে হযরত উমরের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয়। অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী (সা) বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তরে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান।

বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়

রসূলের আনুগত্য করার আহবান হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এখানে বিবৃত সমগ্র ভাষণটি এ কেন্দ্রের চারদিকেই আবর্তিত।

বক্তব্যের সূচনা এভাবে হয় ঃ যারা এ নবীর কথা মেনে নিয়েছে তাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিশ্চিতভাবে এ ধরনের লোকেরাই দুনিয়ায় ও আখেরাতে সাফল্য লাভের যোগ্য হয়।

এরপর মানুষের জন্ম, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া যে, এ নবী তাওহীদ ও আখেরাতের যে চিরন্তন সত্যগুলো তোমাদের মেনে নিতে বলছেন তোমাদের নিজেদের সত্তা এবং এই সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থা সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে।

www.icsbook.info

তারপর নবীদের ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী শুরু হয়ে গেছে। আপাত দৃষ্টিতে এগুলো কাহিনী মনে হলেও মূলত এ পদ্ধতিতে শ্রোতাদেরকে কিছু কথা বুঝানো হয়েছে ঃ

এক ঃ আজ তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ পোষণ ও আপত্তি উত্থাপন করছো সেগুলো নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বেও যেসব নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন, যাদেরকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করে থাকো, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে তাঁদের যুগে মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা এ একই আপত্তি করেছিল। এখন দেখো ইতিহাসের শিক্ষা কি, আপত্তি উত্থাপনকারীরা সত্যপথে ছিল, না নবীগণ?

দুই ঃ তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা দিচ্ছেন এই একই শিক্ষা প্রত্যেক যুগের নবী দিয়েছেন। তার বাইরে এমন কোন অভিনব জিনিস আজ পেশ করা হচ্ছে না যা দুনিয়াবাসী এর আগে কখনো শুনেনি।

তিন ঃ যেসব জাতি নবীদের কথা শোনেনি এবং তাঁদের বিরোধিতার ওপর জিদ ধরেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে।

চার ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক যুগে একই দীন এসেছে এবং সকল নবী একই জাতি বা উম্মাহভুক্ত ছিলেন। সেই একমাত্র দীনটি ছাড়া অন্য যেসব বিচিত্র ধর্মমত তোমরা দুনিয়ার চারদিকে দেখতে পাচ্ছো এগুলো সবই মানুষের স্বকপোলকল্পিত। এর কোনটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়।

এ কাহিনীগুলো বলার পর লোকদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, পার্থিব সমৃদ্ধি, অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এমন জিনিস নয় যা কোন ব্যক্তি বা দলের সঠিক পথের অনুসারী হবার নিশ্চিত আলামত হতে পারে। এর মাধ্যমে একথা বুঝা যায় না যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহশীল এবং তার নীতি ও আচরণ আল্লাহর কাছে প্রিয়। অনুরূপভাবে কারোর গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া একথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তার ও তার নীতির প্রতি বিরূপ। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের ঈমান, আল্লাহ ভীতি ও সততা। এরি ওপর তার আল্লাহর প্রিয় অপ্রিয় হওয়া নির্ভর করে। একথাগুলো এজন্যে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় সে সময় যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল তার সকল নায়কই ছিল মক্কার বড় বড় নেতা ও সরদার। তারা নিজেরাও এ আত্মম্ভরিতায় ভুগছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন লোকেরাও এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছিল যে, যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং যারা একনাগাড়ে সামনের দিকে এগিয়েই চলছে তাদের ওপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ও দেবতাদের নেক নজর রয়েছে। আর এ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত লোকেরা যারা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে আছে এদের নিজেদের অবস্থাই তো একথা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ এদের সাথে নেই এবং দেবতাদের কোপ তো এদের ওপর পড়েই আছে।

এরপর মক্কাবাসীদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাসী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদেরকে জানানো হয়েছে, তোমাদের ওপর এই যে দুর্ভিক্ষ নাযিল হয়েছে এটা একটা সতর্ক বাণী। এ দেখে তোমরা

www.icsbook.info

নিজেরা সংশোধিত হয়ে যাও এবং সরল সঠিক পথে এসে যাও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। নয়তো এরপর আসবে আরো কঠিন শাস্তি, যা দেখে তোমরা আর্তনাদ করতে থাকবে।

তারপর বিশ্ব-জাহানেও তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যে যেসব নিদর্শন রয়েছে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট করা হয়েছে। মূল বক্তব্য হচ্ছে, চোখ মেলে দেখো। এই নবী যে তাওহীদ ও পরকালীন জীবনের তাৎপর্য ও স্বরূপ তোমাদের জানাচ্ছেন চারদিকে কি তার সাক্ষদানকারী নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে নেই? তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি কি তার সত্যতা ও নির্ভুলতার সাক্ষ দিচ্ছে না?

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তোমার সাথে যাই ব্যবহার করে থাকুক না কেন তুমি ভালোভাবে তাদের প্রত্যুত্তর দাও। শয়তান যেন কখনো তোমাকে আবেগ উচ্ছল করে দিয়ে মন্দের জবাবে মন্দ করতে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ না পায়।

বক্তব্য শেষে সত্য বিরোধীদেরকে আখেরাতে জবাবদিহির ভয় দেখানো হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সত্যের আহবায়ক ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যা করছো সেজন্য তোমাদের কঠোর জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

www.icsbook.info

আয়াত ১১৮ | সূরা আল মু'মিনূন–মক্কী | রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝٢
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝٣ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝٤

নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা[১] যারা ঃ
নিজেদের[২] নামাযে বিনয়াবনত[৩] হয়,
বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে,[৪]
যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে,[৫]

১. মু'মিনরা বলতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাঁকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছে এবং তিনি জীবন যাপনের যে পদ্ধতি পেশ করেছেন তা অনুসরণ করে চলতে রাজি হয়েছে।

মূল শব্দ হচ্ছে 'ফালাহ'। ফালাহ মানে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। এটি ক্ষতি, ঘাটতি, লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। যেমন اَفْلَحَ الرَّجُلُ মানে হচ্ছে, অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, নিজের লক্ষে পৌঁছে গেছে, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে গেছে, তার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে, তার অবস্থা ভালো হয়ে গেছে।

قَدْ اَفْلَحَ "নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে।" এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য। তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী সরদারবৃন্দ। তাদের ব্যবসা–বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন–দওলত। বৈষয়িক সমৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীরা। তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত। কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অথবা কাজ–কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধিতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় যখন "নিশ্চিতভাবেই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে" বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এথেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদণ্ড ভুল, তোমাদের অনুমান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি দূরপ্রসারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো

www.icsbook.info

তা আসলে সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক। এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর ওকে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দুনিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে।

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. এখান থেকে নিয়ে ৯ আয়াত পর্যন্ত মু'মিনদের যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ। অন্য কথায়, বলা হচ্ছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী তারা কেনইবা সফল হবে না। এ গুণাবলী সম্পন্ন লোকেরা ব্যর্থ ও অসফল কেমন করে হতে পারে। তারাই যদি সফলকাম না হয় তাহলে আর কারা সফলকাম হবে।

৩. মূল শব্দ হচ্ছে "খুশূ"। এর আসল মানে হচ্ছে কারোর সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থাটার সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও। মনের খুশূ' হচ্ছে, মানুষ কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে। আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কণ্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে। নামাযে খুশূ' বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে, সে নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, لو خشع قلبه خشعت جوارحه "যদি তার মনে খুশূ' থাকতো তাহলে তার দেহেও খুশূ'র সঞ্চার হতো।"

যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, যেমন ওপরে উল্লেখিত হাদীস থেকে এখনই জানা গেলো, তবুও শরীয়াতে নামাযের এমন কিছু নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ' (আন্তরিক বিনয়-নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকাণ্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নামাযী যেন ডাইনে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে না তাকায়, (বড়জোর শুধুমাত্র চোখের কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে পারে। হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম না করা উচিত। কিন্তু মালেকীগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত।) নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। গর্বিত ভংগীতে

www.icsbook.info

খাড়া হওয়া, জোরে জোরে ধমকের সুরে কুরআন পড়া অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে গান গাওয়াও নামাযের নিয়ম বিরোধী; জোরে জোরে আড়মোড়া ভাংগা ও ঢেকুর তোলাও নামাযের মধ্যে বেআদবী হিসেবে গণ্য। তাড়াহুড়া করে টপাটপ নামায পড়ে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, নামাযের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি কাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা উভয় হাত একসাথে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে নামাযের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। কিন্তু মানুষের পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেন তারই আর্জি পেশ করে। এ সময়ের মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

৪. মূলে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়—সেগুলো সবই 'বাজে' কাজের অন্তরভুক্ত।

مُعْرِضُونَ শব্দের অনুবাদ করেছি 'দূরে থাকে'। কিন্তু এতটুকুতে সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ হয় না। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাজ চলতে থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ করতে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

"যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।"
(আল ফুরকান, ৭২ আয়াত)

এ ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তরভুক্ত। মু'মিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে সবসময় দায়িত্বানুভূতি সজাগ থাকে, সে মনে করে দুনিয়াটা আসলে একটা পরীক্ষাগৃহ। যে জিনিসটিকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটি আসলে একটি মাপাজোকা মেয়াদ। তাকে পরীক্ষা করার জন্য এ সময়-কালটি দেয়া হয়েছে। যে ছাত্রটি

www.icsbook.info

পরীক্ষার হলে বসে নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব লিখে চলছে সে যেমন নিজের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পূর্ণ ব্যস্ততা সহকারে তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দেয়, এ অনুভূতিও ঠিক তেমনি মু'মিনকে গুরুত্ব ও ব্যস্ততা সহকারে নিমগ্ন করে দেয়। সেই ছাত্রটি যেমন অনুভব করে পরীক্ষার এ ঘন্টা ক'টি তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং এ অনুভূতির কারণে সে এ ঘন্টাগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক জবাব লেখার প্রচেষ্টায় ব্যয় করতে চায় এবং এগুলোর একটি সেকেণ্ডও বাজে কাজে নষ্ট করতে চায় না, ঠিক তেমনি মু'মিনও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর। এমনকি সে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের কারণ হয় না বরং কোন অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরি করে। তার দৃষ্টিতে সময় 'ক্ষেপণ' করার জিনিস হয় না বরং ব্যবহার করার জিনিস হয়। অন্য কথায়, সময় কাটানোর জিনিস নয়—কাজে 'খাটানোর' জিনিস।

এ ছাড়াও মু'মিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গপ্ মারা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাংগ, কৌতুক, ও হাল্কা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ তাকে যে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً " সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।"

৫. "যাকাত দেয়া" ও "যাকাতের পথে সক্রিয় থাকা"র মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিরাট ফারাক আছে। একে উপেক্ষা করে উভয়কে একই অর্থবোধক মনে করা ঠিক নয়। এটা নিশ্চয়ই গভীর তাৎপর্যবহ যে, এখানে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ এর সর্বজন পরিচিত বর্ণনাভংগী পরিহার করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ এর অপ্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে "পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি" এবং দ্বিতীয়টি "বিকাশ সাধন"—কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূর করা এবং তার মৌল উপাদান ও প্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা। এ দু'টি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণ ধারণাটি সৃষ্টি হয়। তারপর এ শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ হয়। এক, এমন ধন-সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি। যদি يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে। এভাবে শুধুমাত্র সম্পদ দেবার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُونَ বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি

www.icsbook.info

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝٥ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝٧

নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে,[৬] নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না; তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী,[৭]

শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আত্মার পরিশুদ্ধি চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। আর এছাড়াও এর অর্থ কেবলমাত্র নিজেরই জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কাজেই অন্য কথায় এ আয়াতের অনুবাদ হবে তারা পরিশুদ্ধির কার্য সম্পাদনকারী লোক।" অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যেও মৌল মানবিক উপাদানের বিকাশ সাধন করে এবং বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'লায় বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

"সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে।"

সূরা শামসে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে।"

কিন্তু এ দু'টির তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী। কারণ এ দু'টি আয়াত শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়তটি স্বয়ং শুদ্ধিকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করে আর এ কর্মটির মধ্যে নিজের সত্তা ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুদ্ধি শামিল রয়েছে।

৬. এর দু'টি অর্থ হয়। এক, নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলংগ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না। দুই, তারা নিজেদের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং

www.icsbook.info

কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না। (আরো ব্যাখার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, ৩০–৩২ টীকা।)

৭. এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। "লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" বাক্যাংশটি থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এ বাক্যটি বলা হয়েছে। দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। যদি কেবল মাত্র "সফলতা লাভকারী মু'মিনরা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" এতটুকু কথা বলেই বাক্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ বিভ্রান্তিটি জোরদার হয়ে যেতো। কারণ এর এ অর্থ করা যেতে পারতো যে, তারা মালকোঁচা মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে–শাদীর ঝামেলায় তারা যায় না। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তির সেবা করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ।

এ প্রাসংগিক বাক্যটি থেকে কয়েকটি বিধান বের হয়। এগুলো সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

এক ঃ লজ্জাস্থান হেফাজত করার সাধারণ হুকুম থেকে দু'ধরনের স্ত্রীলোককে বাদ দেয়া হয়েছে। এক, স্ত্রী। দুই, مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ । স্ত্রী (ازواج) শব্দটি আরবী ভাষার পরিচিত ব্যবহার এবং স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কেবলমাত্র এমনসব নারী সম্পর্কে বলা হয় যাদেরকে যথারীতি বিবাহ করা হয়েছে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত "স্ত্রী" শব্দটি এরি সমার্থবোধক। আর مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ বলতে যে বাঁদী বুঝায় আরবী প্রবাদ ও কুরআনের ব্যবহার উভয়ই তার সাক্ষী। অর্থাৎ এমন বাঁদী যার ওপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। এভাবে এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন বাঁদীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয় বরং মালিকানা। যদি এ জন্যও বিয়ে শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করেও বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিবাহিত হলে সে ও স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত হতো। বর্তমানকালের কোন কোন মুফাস্সির যারা বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগ স্বীকার করেননি তারা সূরা নিসার (২৫ আয়াত) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ আয়াতটি থেকে যুক্তি আহরণ করে একথা প্রমাণ করতে চান যে, বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগও কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কারণ সেখানে হুকুম দেয়া হয়েছে, যদি আর্থিক দুরবস্থার কারণে তোমরা কোন স্বাধীন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখো তাহলে কোন বাঁদীকে বিয়ে করো। কিন্তু এসব লোকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট লক্ষ করার মতো। এরা একই আয়াতের একটি অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্যের পক্ষে লাভজনক দেখতে পেয়ে গ্রহণ করে নেন, আবার সে একই আয়াতের যে অংশটি এদের উদ্দেশ্য বিরোধী হয় তাকে জেনে বুঝে বাদ দিয়ে দেন। এ আয়াতে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ যেসব শব্দের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

www.icsbook.info

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"কাজেই এ বাঁদীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও এদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং এদেরকে এদের পরিচিত পদ্ধতিতে মোহরানা প্রদান করো।" এ শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে বাঁদীর মালিকের বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং এমন ব্যক্তির বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, যে স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করার ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বাঁদীকে বিয়ে করতে চায়। নয়তো যদি নিজেরই বাঁদীকে বিয়ে করার ব্যাপার হয় তাহলে তার এ "অভিভাবক" কে হতে পারে যার কাছ থেকে তার অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয়? কিন্তু কুরআনের সাথে কৌতুককারীরা কেবলমাত্র فَانْكِحُوْهُنَّ -কে গ্রহণ করেন অথচ তার পরেই যে بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ এসেছে তাকে উপেক্ষা করেন। তাছাড়াও তারা একটি আয়াতের এমন অর্থ বের করেন যা এ একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। কোন ব্যক্তি যদি নিজের চিন্তাধারার নয় বরং কুরআন মজীদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যি সূরা নিসার ৩-৩৫, সূরা আহযাবের ৫০-৫২ এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতকে সূরা মুমিনূনের এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। এভাবে সে নিজেই এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি তা জানতে পারবে। (এ বিষয়ে আরো বেশী বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৪ টীকা; তাফহীমাত (মওদূদী রচনাবলী) ২য় খণ্ড ২৯০ থেকে ৩২৪ পৃঃ এবং রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড, ৩২৪ থেকে ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

দুই ঃ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ বাক্যাংশে عَلٰى শব্দটি একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ আনুসংগিক বাক্যে আইনের যে ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সম্পর্ক শুধু পুরুষদের সংগে। বাকি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ থেকে নিয়ে خٰلِدُوْنَ পর্যন্ত পুরো আয়াতটিতেই সর্বনাম পুং লিঙ্গে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় পুরুষ ও নারীর সমষ্টির কথা যখন বলা হয় তখন সর্বনামের উল্লেখ পুং লিংগেই করা হয়। কিন্তু এখানে لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ এর হুকুমের বাইরে রেখে عَلٰى শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যতিক্রমটি পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। যদি "এদের কাছে" না বলে "এদের থেকে" হেফাজত না করলে তাদেরকে নিন্দনীয় নয় বলা হতো, তাহলে অবশ্যই এ হুকুমটিও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কার্যকর হতে পারতো। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না বুঝার কারণে হযরত উমরের (রা) যুগে জনৈকা মহিলা তাঁর গোলামের সাথে যৌন সম্ভোগ করে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে শূরায় যখন তাঁর বিষয়টি পেশ হলো তখন সবাই এক বাক্যে বললেন ঃ تاولت كتاب الله تعالى غير تاويله অর্থাৎ "সে আল্লাহর কিতাবের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে।" এখানে কারোর মনে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এ ব্যতিক্রম যদি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীরা কেমন করে হালাল হলো? এ সন্দেহটি সঠিক না হবার কারণ হচ্ছে এই যে,

www.icsbook.info

যখন স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে পুরুষাংগ হেফাজত করার হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে তখন নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীরা আপনা আপনিই এ হুকুমের বাইরে চলে গেছে। এরপর তাদের জন্য আর আলাদা সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন থাকেনি। এভাবে এ ব্যতিক্রমের হুকুমের প্রভাব কার্যত শুধুমাত্র পুরুষ ও তার মলিকানাধীন নারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং নারীর জন্য তার গোলামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হারাম গণ্য হয়। নারীর জন্য এ জিনিসটি হারাম গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, গোলাম তার প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তার ও তার গৃহের পরিচালক হতে পারে না এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও শৃংখল ঢিলা থেকে যায়।

তিন ঃ "তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী"–এ বাক্যটি ওপরে উল্লেখিত দু'টি বৈধ আকার ছাড়া যিনা বা সমকাম অথবা পশু–সংগম কিংবা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যাই কিছু হোক না কেন সবই হারাম করে দিয়েছে। একমাত্র হস্তমৈথুনের (Masturbation) ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একে জায়েয গণ্য করেন। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে চূড়ান্ত হারাম বলেন। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যদিও এটি হারাম তবুও তারা বলেন, যদি চরম মুহূর্তে কখনো কখনো এ রকম কাজ করে বসে তাহলে আশা করা যায় তা মাফ করে দেয়া হবে।

চার ঃ কোন কোন মুফাস্‌সির মুতা' বিবাহ হারাম হবার বিষয়টিও এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, যে মেয়েকে মুতা' বিয়ে করা হয় সে না স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত, না বাঁদীর। বাঁদী তো সে নয় একথা সুস্পষ্ট, আবার স্ত্রীও নয়। কারণ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করার জন্য যতগুলো আইনগত বিধান আছে তার কোনটাই তার ওপর আরোপিত হয় না। সে পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় না, পুরুষও তার উত্তরাধিকারী হয় না। তার জন্য ইদ্দত নেই, তালাকও নেই, খোরপোশ নেই এবং ঈলা, যিহার ও লি'আন ইত্যাদি কোনটিই নেই। বরং সে চার স্ত্রীর নির্ধারিত সীমানার বাইরে অবস্থান করছে। কাজেই সে যখন "স্ত্রী" ও "বাঁদী" কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না তখন নিশ্চয়ই সে 'এর বাইরে আরো কিছু'র মধ্যে গণ্য হবে। আর এ আরো কিছু যারা চায় তাদেরকে কুরআন সীমালংঘনকারী গণ্য করেছে। এ যুক্তিটি অনেক শক্তিশালী। তবে এর মধ্যে একটি দুর্বলতার দিকও আছে। আর এ দুর্বলতার কারণে এ আয়াতটির বলেই যে, মুতা' হারাম হয়েছে সে কথা বলা কঠিন। এ দুর্বলতাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতা' হারাম হবার শেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণা দেন মক্কা বিজয়ের বছরে। এর পূর্বে অনুমতির প্রমাণ সহী হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, মুতা' হারাম হবার হুকুম কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল আর এ আয়াতটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত এবং এটি হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তাহলে কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত একে জায়েয রেখেছিলেন? কাজেই একথা বলাই বেশী নির্ভুল যে, মুতা' বিয়ে কুরআন মজীদের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমেই হারাম হয়েছে। সুন্নাতের মধ্যে যদি এ বিষয়টির সুস্পষ্ট

www.icsbook.info

ফায়সালা না থাকতো তাহলে নিছক এ আয়াতের ভিত্তিতে এর হারাম হওয়ার ফায়সালা দেয়া কঠিন ছিল। মুতা'র আলোচনা যখন এসে গেছে তখন আরো দু'টি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সংগত বলে মনে হয়। এক, এর হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত। কাজেই হযরত উমর (রা) একে হারাম করেছেন, একথা বলা ঠিক নয়। হযরত উমর (রা) এ বিধিটির প্রবর্তক বা রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন কেবলমাত্র এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী। যেহেতু এ হুকুমটি রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আমলের শেষের দিকে দিয়েছিলেন এবং সাধারণ লোকদের কাছে এটি পৌঁছেনি তাই হযরত উমর (রা) এটিকে সাধারণ্যে প্রচার ও আইনের সাহায্যে কার্যকরী করেছিলেন। দুই, শীয়াগণ মুতা'কে সর্বতোভাবে ও শর্তহীনভাবে মুবাহ সাব্যস্ত করার যে নীতি অবলম্বন করেছেন কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও তার কোন অবকাশই নেই। প্রথম যুগের সাহাবা, তাবেঈ ও ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা এর বৈধতার সমর্থক ছিলেন তাঁরা শুধুমাত্র অনন্যোপায় অবস্থায় অনিবার্য পরিস্থিতিতে এবং চরম প্রয়োজনের সময় একে বৈধ গণ্য করেছিলেন। তাদের একজনও একে বিবাহের মতো শর্তহীন মুবাহ এবং সাধারণ অবস্থায় অবলম্বনযোগ্য বলেননি। বৈধতার প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে পেশ করা হয় হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) নাম। তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ ما هى الا كالميتة لا تحل الا للمضطر (এ হচ্ছে মৃতের মতো, যে ব্যক্তি অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়েছে তার ছাড়া আর কারোর জন্য বৈধ নয়।) আবার তিনি যখন দেখলেন তাঁর এ বৈধতার অবকাশ-দানমূলক ফতোয়া থেকে লোকেরা অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে যথেচ্ছভাবে মুতা' করতে শুরু করেছে এবং তাকে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত মুলতবী করছে না তখন তিনি নিজের ফতওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন। ইবনে আব্বাস ও তাঁর সমমনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁদের এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটি যদি বাদ দেয়াও যায় তাহলে তাদের মত গ্রহণকারীরা বড় জোর "ইযতিরার" তথা অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থায় একে বৈধ বলতে পারেন। অবাধ ও শর্তহীন মুবাহ এবং প্রয়োজন ছাড়াই মুতা' বিবাহ করা এমন কি বিবাহিত স্ত্রীদের উপস্থিতিতেও মুতা-বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্ভোগ করা এমন একটি স্বেচ্ছাচার যাকে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ রুচিবোধও কোনদিন বরদাশত করে না। ইসলামী শরীয়াত ও রসূল বংশোদ্ভূত ইমামদেরকে এর সাথে জড়িত মনে করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি মনে করি, শীয়াদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ও রুচিবান ব্যক্তিও তার মেয়ের জন্য কেউ বিবাহের পরিবর্তে মুতা'র প্রস্তাব দেবে এটা বরদাশত করতে পারেন না। এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, মুতা'র বৈধতার জন্য সমাজে বারবনিতাদের মতো মেয়েদের এমন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী থাকতে হবে যাদের সাথে মুতা' করার অবাধ সুযোগ থাকে। অথবা মুতা' হবে শুধুমাত্র গরীবদের কন্যা ও ভগিনীদের জন্য এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করার অধিকারী হবে সমাজের ধনিক ও সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীর পুরুষেরা। আল্লাহ ও রসূলের শরীয়াত থেকে কি এ ধরনের বৈষম্যপূর্ণ ও ইনসাফবিহীন আইনের আশা করা যেতে পারে? আবার আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে কি এটাও আশা করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কোন কাজকে মুবাহ করে দেবেন যাকে যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে নিজের জন্য অমর্যাদাকর এবং বেহায়াপনা মনে করে?

www.icsbook.info

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى
صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ
الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١

নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে[৮]

এবং নিজেদের নামাযগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করে,[৯]

তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস[১০] লাভ করবে এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।[১১]

৮. "আমানত" শব্দটি বিশ্ব-জাহানের প্রভু অথবা সমাজ কিংবা ব্যক্তি যে আমানত কাউকে সোপর্দ করেছেন তা সবগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এমন যাবতীয় চুক্তি প্রতিশ্রুতি ও অংগীকারের অন্তরভুক্ত হয় যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে অথবা মানুষ ও মানুষের মধ্যে কিংবা জাতি ও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। মু'মিনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করে না এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অংগীকার ভংগ করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তাঁর ভাষণে বলতেন ঃ

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهٗ

"যার মধ্যে আমানতদারীর গুণ নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ নেই তার মধ্যে দীনদারী নেই।" (বাইহাকী, ঈমানের শাখা-প্রশাখাসমূহ)

বুখারী ও মুসলিম একযোগে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "চারটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে নিখাদ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে তা মুনাফিকীর একটি অভ্যাস হিসেবেই থাকে। সে চারটি অভ্যাস হচ্ছে, কোন আমানত তাকে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে, কখনো কথা বললে মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভংগ করে এবং যখনই কারোর সাথে ঝগড়া করে তখনই (নৈতিকতা ও সততার) সমস্ত সীমা লংঘন করে।"

৯. ওপরের খুশূ'র আলোচনায় নামায শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে "নামাযগুলো" বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ ছিল মূল নামায আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের নামায সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। "নামাযগুলোর সংরক্ষণ"-এর অর্থ হচ্ছে ঃ সে নামাযের সময়, নামাযের নিয়ম-কানুন, আরকান ও আহকাম মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের

www.icsbook.info

প্রতি পুরোপুরি নজর রাখে। শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখে। অযু ঠিক মতো করে। কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে। সঠিক সময়ে নামায পড়ার চিন্তা করে। সময় পার করে দিয়ে নামায পড়ে না। নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ণ একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না। যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দা তার প্রভু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে, এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবাঁধা বাক্য আউড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুঁকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

১০. ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বলা হয় পরদেষা, প্রাচীন কুলদানী ভাষায় পরদেসা, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা, হিব্রু ভাষায় পারদেস, আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ, সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাডাইসোস, ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং আরবী ভাষায় ফিরদৌস। এ শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাঁচিল দেয়া থাকে, বাগানটি বিস্তৃত হয়, মানুষের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল বিশেষ করে আংগুর পাওয়া যায়। বরং কোন কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে একথাও বুঝা যায় যে, এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু–পাখিও পাওয়া যায়। কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহেলী যুগের ভাষায়ও ফিরদৌস শব্দের ব্যবহার ছিল। কুরআনে বিভিন্ন বাগানের সমষ্টিকে ফিরদৌস বলা হয়েছে। যেমন সূরা কাহফে বলা হয়েছে ঃ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا "তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে।" এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ–বাগিচা–উদ্যান রয়েছে।

মু'মিনদের ফিরদৌসের অধিকারী হবার বিষয়টির ওপর সূরা ত্বা–হা (৮৩ টীকা) ও সূরা আল আম্বিয়ায় (৯৯ টীকা) যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতগুলোতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

এক ঃ যারাই কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নিয়ে এ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করবে এবং এ নীতির অনুসারী হবে তারা যে কোন দেশ, জাতি ও গোত্রেরই হোক না কেন অবশ্যই তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

দুই ঃ সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষণা, অথবা নিছক সৎচরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়। বরং উভয়ের সম্মিলনের ফল। মানুষ যখন আল্লাহর পাঠানো পথনির্দেশ মেনে চলে এবং তারপর সে অনুযায়ী নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও সৎকর্মশীলতা সৃষ্টি করে তখন সে সফলতা লাভ করে।

তিন ঃ নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদশালিতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। বরং তা একটি ব্যাপকতর কল্যাণকর অবস্থার নাম। দুনিয়ায় ও আখেরাতে

www.icsbook.info

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً
فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ
اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿١٧﴾ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ
فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ﴿١٨﴾

আমি মানুষকে তৈরি করেছি মাটির উপাদান থেকে, তারপর তাকে একটি সংরক্ষিত স্থানে টপ্‌কে পড়া ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি, এরপর সেই ফোঁটাকে জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি, তারপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর মাংসপিণ্ডে অস্থি-পঞ্জর স্থাপন করেছি, তারপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিয়েছি গোশত দিয়ে,[১২] তারপর তাকে দাঁড় করেছি স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি রূপে।[১৩] কাজেই আল্লাহ বড়ই বরকত সম্পন্ন,[১৪] সকল কারিগরের চাইতে উত্তম কারিগর তিনি। এরপর তোমাদের অবশ্যই মরতে হবে, তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

আর তোমাদের ওপর আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি,[১৫] সৃষ্টিকর্ম আমার মোটেই অজানা ছিল না।[১৬] আর আকাশ থেকে আমি ঠিক হিসেব মতো একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী পানি বর্ষণ করেছি এবং তাকে ভূমিতে সংরক্ষণ করেছি।[১৭] আমি তাকে যেভাবে ইচ্ছা অদৃশ্য করে দিতে পারি।[১৮]

স্থায়ী সাফল্য ও পরিতৃপ্তিকেই এ নামে অভিহিত করা হয়। এটি ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া অর্জিত হয় না। পথভ্রষ্টদের সাময়িক সমৃদ্ধি ও সাফল্য এবং সৎ মুমিনদের সাময়িক বিপদ আপদকে এ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য করা যেতে পারে না।

চার ঃ মুমিনদের এ গুণাবলীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার এ বিষয়বস্তুটিই সামনের দিকের ভাষণের সাথে এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক কায়েম করে। তৃতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ

www.icsbook.info

ভাষণটির যুক্তির ধারা যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, শুরুতে আছে অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তি। অর্থাৎ এ নবীর শিক্ষা তোমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ বিশেষ ধরনের জীবন, চরিত্র, কর্মকাণ্ড, নৈতিকতা ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, এ শিক্ষা সত্য না হলে এ ধরনের কল্যাণময় ফল কিভাবে সৃষ্টি করতে পারতো? এরপর হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ যুক্তি। অর্থাৎ মানুষের নিজের সত্তায় ও চারপাশের বিশ্বে যে নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা সবই তাওহীদ ও আখেরাতের এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। তারপর আসে ঐতিহাসিক যুক্তির কথা। এ যুক্তিগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ও তাঁর দাওয়াত অস্বীকারকারীদের সংঘাত আজ নতুন নয় বরং একই কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকে তা চলে আসছে। এ সংঘাতের প্রতিটি যুগে একই ফলাফলের প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় দলের মধ্যে কে সত্য পথে ছিল এবং কে ছিল মিথ্যার পথে।

১২. ব্যাখ্যার জন্য সূরা হজ্জের ৫, ৬ ও ৯ টীকা দেখুন।

১৩. অর্থাৎ কোন মুক্তমনের অধিকারী ব্যক্তি শিশুকে মাতৃগর্ভে লালিত পালিত হতে দেখে একথা ধারণাও করতে পারে না যে, এখানে এমন একটি মানুষ তৈরী হচ্ছে, যে বাইরে এসে জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্পকর্মের এসব নৈপুণ্য দেখাবে এবং তার থেকে এ ধরনের বিস্ময়কর শক্তি ও যোগ্যতার প্রকাশ ঘটবে। সেখানে সে হয় হাড় ও রক্ত মাংসের একটি দলা পাকানো পিণ্ডের মতো। তার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্যন্ত জীবনের প্রারম্ভিক বৈশিষ্টসমূহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তার মধ্যে থাকে না শ্রবণ শক্তি, থাকে না দৃষ্টি শক্তি, বাকশক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনা ও অন্য কোন গুণ। কিন্তু বাইরে এসেই সে অন্য কিছু হয়ে যায়। পেটে অবস্থানকারী ভ্রূণের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই থাকে না। অথচ এখন সে শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও বাকশক্তির অধিকারী একটি সত্তা। এখন সে অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে। এখন তার মধ্যে এমন একটি ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটার সূচনা হয় যে জাগ্রত হবার পরপরই প্রথম মুহূর্ত থেকেই নিজের আওতাধীন প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা চালায়। তারপর সে যতই এগিয়ে যেতে থাকে তার সত্তা থেকে এ "অন্য জিনিস" হবার অবস্থা আরো সুস্পষ্ট ও আরো বিকশিত হতে থাকে। যৌবনে পদার্পণ করে শৈশব থেকে ভিন্ন কিছু হয়ে যায়। পৌঢ়ত্বে পৌঁছে যৌবনের তুলনায় অন্য কিছু প্রমাণিত হয়। বার্ধক্যে উপনীত হবার পর নতুন প্রজন্মের জন্য একথা অনুমান করাই কঠিন হয়ে পড়ে যে, তার শিশুকাল কেমন ছিল এবং যৌবনকালে কি অবস্থা ছিল। এত বড় পরিবর্তন অন্তত এ দুনিয়ার অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে ঘটে না। কোন ব্যক্তি যদি একদিকে কোন বর্ষীয়ান পুরুষের শক্তি, যোগ্যতা ও কাজ দেখে এবং অন্য দিকে একথা কল্পনা করতে থাকে যে, পঞ্চাশ ষাট বছর আগে একদা যে একটি ফোঁটা মায়ের গর্ভকোষে টপ্‌কে পড়েছিল তার মধ্যে এত সবকিছু নিহিত ছিল, তাহলে স্বতস্ফূর্তভাবে সে একই কথা বের হয়ে আসবে যা সামনের দিকের বাক্যের মধ্যে আসছে।

১৪. মূলে تَبٰرَكَ اللّٰهُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে এর সমগ্র গভীর অর্থ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আভিধানিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর মধ্যে দু'টি অর্থ

www.icsbook.info

পাওয়া যায়। এক, তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। দুই, তিনি এমনই কল্যাণ ও সদগুণের অধিকারী যে, তাঁর সম্পর্কে তোমরা যতটুকু অনুমান করবে তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁকে পাবে। এমনকি তাঁর কল্যাণের ধারা কোথাও গিয়ে শেষ হয় না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ১ ও ১৯ টীকা) এ দু'টি অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করলে একথা বুঝা যাবে যে, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করার পর فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ বাক্যাংশটি নিছক একটি প্রশংসামূলক বাক্যাংশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি বরং এটি হচ্ছে যুক্তির পরে যুক্তির উপসংহারও। এর মধ্যে যেন একথাই বলা হচ্ছে যে, যে আল্লাহ একটি মাটির টিলাকে ক্রমোন্নত করে একটি পূর্ণ মানবিক মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন তিনি প্রভুত্বের ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ শরীক হবে এ থেকে অনেক বশী পাক–পবিত্র ও উর্ধে। তিনি এ একই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন, কি পারেন না এরূপ সন্দেহ–সংশয় থেকে অনেক বেশী পাক–পবিত্র। আর তিনি একবারই মানুষ সৃষ্টি করে দেবার পর তাঁর সব নৈপুণ্য খতম হয়ে যায় এবং এরপর তিনি আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ ক্ষমতা সম্পর্কে এটা বড়ই নিকৃষ্ট ধারণা।

১৫. মূলে طرائق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে পথও হয় আবার স্তরও হয়। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে সম্ভবত এর অর্থ হবে সাতটি গ্রহের আবর্তন পথ। আর যেহেতু সে যুগে মানুষ সাতটি গ্রহ সম্পর্কেই জানতো তাই সাতটি পথের কথা বলা হয়েছে। এর মানে অবশ্যই এ নয় যে, এগুলো ছাড়া আর কোন পথ নেই। আর যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে سَبْعَ طَرَائِقَ এর অর্থ তাই হবে যা سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا (সাতটি আকাশ স্তরে স্তরে) এর অর্থ হয়। আর এই সংগে যে বলা হয়েছে "তোমাদের ওপর" আমি সাতটি পথ নির্মাণ করেছি, এর একটি সহজ সরল অর্থ হবে তাই যা এর বাহ্যিক শব্দগুলো থেকে বুঝা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটি হবে, তোমাদের চাইতে বড় জিনিস আমি নির্মাণ করেছি এ আকাশ। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

"আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চাইতে অনেক বড় কাজ।"

(আল মুমিন, ৫৭ আয়াত)

১৬. অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে, "আর সৃষ্টিকূলের পক্ষ থেকে আমি গাফিল ছিলাম না অথবা নই।" মূল বাক্যে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হয় ঃ এসব কিছু যা আমি বানিয়েছি এগুলো এমনি হঠাৎ কোন আনাড়ির হাত দিয়ে আন্দাজে তৈরী হয়ে যায়নি। বরং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ জ্ঞান সহকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইন সক্রিয় রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব–জাহানের ছোট থেকে নিয়ে বড় পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যে একটি পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। এ বিশাল কর্ম জগতে ও বিশ্ব–জগতের এ সুবিশাল কারখানায় সব দিকেই একটি উদ্দেশ্যমুখিনতা দেখা যাচ্ছে। এসব স্রষ্টার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রমাণ পেশ করছে। দ্বিতীয় অনুবাদটি গ্রহণ করলে এর অর্থ হবে ঃ এ বিশ্ব–জাহানে আমি যা কিছুই সৃষ্টি করেছি

www.icsbook.info

তাদের কারোর কোন প্রয়োজন থেকে আমি কখনো গাফিল এবং কোন অবস্থা থেকে কখনো বেখবর থাকিনি। কোন জিনিসকে আমি নিজের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তৈরী হতে ও চলতে দেইনি। কোন জিনিসের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সরবরাহ করতে আমি কখনো কুণ্ঠিত হইনি। প্রত্যেকটি বিন্দু, বালুকণা ও পত্র-পল্লবের অবস্থা আমি অবগত থেকেছি।

১৭. যদিও এর অর্থ হতে পারে মওসুমী বৃষ্টিপাত কিন্তু আয়াতের শব্দ বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অন্য একটি অর্থও এখান থেকে বুঝা যায়। সেটি হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ একই সংগে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে নাযিল করেছিলেন যা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এ গ্রহটির প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ পানি পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে রক্ষিত হয়েছে। এর সাহায্যে সাগর ও মহাসাগরের জন্ম হয়েছে এবং ভূগর্ভেও পানি (Sub-soil water) সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ পানিই ঘুরে ফিরে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী-নালা ঝরণা ও কুয়া এ পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। অসংখ্য জিনিসের সৃষ্টি ও উৎপাদনে এরি বিশিষ্ট ভূমিকা দেখা যায়। তারপর এ পানি বায়ুর সাথে মিশে গিয়ে আবার তার মূল ভাণ্ডারের দিকে ফিরে যায়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পানির এ ভাণ্ডার এক বিন্দুও কমেনি এবং এক বিন্দু বাড়াবারও দরকার হয়নি। এর চাইতেও বেশী আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রই একথা জানে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির উৎপত্তি হয়েছে। একবার এত বিপুল পরিমাণ পানি তৈরী হয়ে গেছে যে, এর সাহায্যে সমুদ্র ভরে গেছে এবং এখন এর ভাণ্ডারে এক বিন্দুও বাড়ছে না। কে তিনি যিনি এক সময় এ বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে এ অথৈ পানির ভাণ্ডার সৃষ্টি করে দিয়েছেন? আবার কে তিনি যিনি এখন আর এ দু'টি গ্যাসকে সে বিশেষ অনুপাতে মিশতে দেন না যার ফলে পানি উৎপন্ন হয়, অথচ এ দু'টি গ্যাস এখনো দুনিয়ার বুকে মওজুদ রয়েছে? আর পানি যখন বাষ্প হয়ে বাতাসে উড়ে যায় তখন কে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনকে আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে বাধা দেয়? নাস্তিক্যবাদীদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে? আর যারা পানি ও বাতাস এবং উষ্ণতা ও শৈত্যের পৃথক পৃথক সৃষ্টিকর্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের কাছে কি এর কোন জবাব আছে?

১৮. অর্থাৎ তাকে অদৃশ্য করার কোন একটাই পদ্ধতি নেই। অসংখ্য পদ্ধতিতে তাকে অদৃশ্য করা সম্ভব। এর মধ্য থেকে যে কোনটিকে আমরা যখনই চাই ব্যবহার করে তোমাদেরকে জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি থেকে বঞ্চিত করতে পারি। এভাবে এ আয়াতটি সূরা মুল্‌কের আয়াতটি থেকে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে যেখানে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ

"তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যমীন যদি তোমাদের এ পানিকে নিজের ভেতরে শুষে নেয়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান ঝরণাধারা এনে দেবে।"

www.icsbook.info

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنۢبُتُ
بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم
مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

তারপর এ পানির মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যই এ বাগানগুলোয় রয়েছে প্রচুর সুস্বাদু ফল[১৯] এবং সেগুলো থেকে তোমরা জীবিকা লাভ করে থাকো।[২০] আর সিনাই পাহাড়ে যে গাছ জন্মায় তাও আমি সৃষ্টি করেছি[২১] তা তেল উৎপন্ন করে এবং আহারকারীদের জন্য তরকারীও।

আর প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য গবাদি পশুদের মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের মধ্যে যাকিছু আছে তা থেকে একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই[২২] এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে আরো অনেক উপকারিতাও আছে, তাদেরকে তোমরা খেয়ে থাকো এবং তাদের ওপর ও নৌযানে আরোহণও করে থাকো।[২৩]

১৯. অর্থাৎ খেজুর ও আংগুর ছাড়াও আরো নানান ধরনের ফল–ফলাদি।

২০. অর্থাৎ এসব বাগানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি, ফল, শস্য, কাঠ এবং অন্যান্য যেসব দ্রব্য তোমরা বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করো, এসব থেকে তোমরা নিজেদের জন্য জীবিকা আহরণ করো। مِنْهَا تَأْكُلُونَ (যেগুলো থেকে তোমরা খাও) এর মধ্যে যে "যেগুলো" শব্দটি রয়েছে এটির মাধ্যমে বাগানগুলো বুঝানো হয়েছে, ফল–ফলাদি নয়। আর تَأْكُلُونَ মানে শুধু এই নয় যে, এ বাগানগুলোর ফল তোমরা খাও বরং এ শব্দটি সামগ্রিকভাবে জীবিকা অর্জন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি নিজের অমুক কাজের ভাত খাচ্ছে, ঠিক তেমনি আরবী ভাষায়ও বলা হয় فلان ياكل من حرفته (অমুক ব্যক্তি তার শিল্পকর্ম থেকে খাচ্ছে অর্থাৎ তার শিল্পকর্ম থেকে জীবিকা অর্জন করছে)।

২১. এখানে জয়তুনের কথা বলা হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের আশপাশের এলাকার উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ গাছগুলো দেড় হাজার দু'হাজার বছর বাঁচে। এমনকি ফিলিস্তিনের কোন কোন গাছের দৈর্ঘ, স্থূলতা ও বিস্তার দেখে অনুমান করা হয়

www.icsbook.info

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ
مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ
هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২ রুকূ'

আমি নূহকে পাঠালাম তার সম্প্রদায়ের কাছে।[২৪] সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবূদ নেই, তোমরা কি ভয় করো না?[২৫] তার সম্প্রদায়ের যেসব সরদার তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো তারা বলতে লাগলো, "এ ব্যক্তি আর কিছুই নয় কিন্তু তোমাদেরই মতো একজন মানুষ।[২৬] এর লক্ষ হচ্ছে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।[২৭] আল্লাহ পাঠাতে চাইলে ফেরেশতা পাঠাতেন।[২৭(ক)] একথা তো আমরা আমাদের বাপদাদাদের আমলে কখনো শুনিনি (যে, মানুষ রসূল হয়ে আসে)। কিছুই নয়, শুধুমাত্র এ লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়ে বসেছে; কিছু দিন আরো দেখে নাও (হয়তো পাগলামি ছেড়ে যাবে)।"

যে, সেগুলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগ থেকে এখনো চলে আসছে। সিনাই পাহাড়ের সাথে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পাহাড় এলাকার সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য স্থানই এর আসল স্বদেশ ভূমি।

২২. অর্থাৎ দুধ। এ সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, রক্ত ও গোবরের মাঝখানে এটি আর একটি তৃতীয় জিনিস। পশুর খাদ্য থেকে এটি সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

২৩. গবাদি পশু ও নৌযানকে একত্রে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরববাসীরা আরোহণ ও বোঝা বহন উভয় কাজের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উট ব্যবহার করতো এবং উটের জন্য "স্থল পথের জাহাজ" উপমাটি অনেক পুরানো। জাহেলী যুগের কবি যুররুম্মাহ বলেন ঃ

سفينة بر تحت خدى زمامها

"স্থলপথের জাহাজ চলে আমার গণ্ডদেশের নিচে তার লাগামটি।"

www.icsbook.info